আল-ইহতিফাল বিল মাউলিদ

বা

নবীজীর মীলাদ উদযাপনের ইতিহাস

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

নবীজির মীলাদ (জন্মোৎসব) উদযাপনের ইতিহাস

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যার মীলাদ তিনি নিজেই — অর্থাৎ নবীজি ﷺ।

ইমাম আলাভী মালিকী বলেন:

“মীলাদ উদযাপনকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই; যেমনটি সহীহ হাদীসে এসেছে, যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন

لَمَّا سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ ، قَالَ ﷺ : ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُّ فِيْهِ ،

যখন তাঁকে সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি ﷺ বলেছিলেন: ‘এ দিনই আমার জন্মদিন।’

فَهٰذَا أَصَحُّ وَأَصْرَحُ نَصٍّ فِيْ مَشْرُوْعِيَّةِ الاحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.

সুতরাং, এটিই নবীজির মীলাদ শরীফ উদযাপনের শরঈ ভিত্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্পষ্ট প্রমাণ।

আর যারা বলে, ‘মীলাদ উদযাপনের শুরু ফাতেমীয়দের দ্বারা হয়েছে’ — তাদের এই বক্তব্য হয়তো বা অজ্ঞতাজনিত, অথবা তারা সত্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করছে।” [1].

আমি বলি,

ফাতিমীয়দের কার্যক্রম প্রকাশ পেতে শুরু করে হিজরি ২৮০ সাল থেকে (২৮০-৫৬২ হি.) তারা ২৯০ হিজরিতে মাগরিব (মরক্কো)-তে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করে।

---

[1]ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল-মালিকী, ওফাত ১৪২৫ হি, **আল-ইলাম বিফাতাওয়া আইম্মাতিল ইসলাম হাউলা মাউলিদিহী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম**, পৃ ১১, দারুল কুতুব আল-ইল্মিয়্যাহ, বাইরুত, ১৪২৬ হিঃ

তাদের বংশধারা সম্মানিত সাইয়্যিদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) পর্যন্ত পৌঁছে— যেমনটি ইমাম ইবনুল আছীর, ইবনু খালদূন ও মাকরিযী প্রমুখ বিশিষ্ট ইমামগণ বর্ণনা করেছেন।
তাদের মিসরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় মীলাদুন্নবী ﷺ আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন শুরু হয় ৩৬২ হি. বা ৩৯৪ হিজরিতে— তবে এটি যে মীলাদ উদযাপনের সূচনা— তা আবশ্যক নয়, তেমনি ২৯০ হিজরিতে মরক্কোতে যা ঘটেছে— সেটিও মীলাদ উদযাপনের শুরু ছিল না।

আমি মনে করি, এই মীলাদ উদযাপন শুরুতে ছিল আহলুল বায়তের একটি ঘরোয়া মজলিস বা বৈঠক। [2] এটি ছিল ইয়াজিদিদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূচনাবিন্দু, একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, যার পেছনে ছিল মিম্বারসহ অন্যান্য স্থানে তাদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু. ও তাঁর সন্তান-সন্ততি, আহলুল বাইত) গালি, অপবাদ, এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতো কর্মকাণ্ড।

এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো— হাফিয ইবনু হাজর আল-আসকালানী (রহ.) তাঁর ফাতহুল বারী (সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

[2] মধ্য প্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে আজও এই মাহফিল আহলে বায়তের সাইয়িদদের ঘরোয়া মাহফিল হিসাবেই উদযাপিত হয়। ফাতেমীরা প্রতিষ্ঠা করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, আবার ফাতেমীরাই মাউলিদ মাহফিলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন শুরু করে। যে কারণে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই মাহফিল আয়োজন করে।

তারা (ইয়াজিদি শাসকগোষ্ঠী) হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বারে ‘লানত’ অভিশাপ দেওয়াকে একটি সুন্নত বানিয়ে নিয়েছিল।

হাফিয ইবনু হাজর (রহ.) বলেনঃ

তিনি (বুখারী) বর্ণনা করেছেন— “باب مناقب علي بن أبي طالب” অর্থাৎ: আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদাসমূহের অধ্যায়।

তিনি হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিব বংশীয় কুরাইশি হাশেমি, আবুল হাসান। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই, রাসূলের পিতার প্রকৃত ভাইয়ের সন্তান।

তাঁর নাম ছিল ‘আবদু মানাফ’ — এটাই অধিক নির্ভরযোগ্য মত। তিনি নবুয়তের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন — এটাই প্রধান অভিমত।

নবী ﷺ তাঁকে ছোটবেলা থেকেই নিজের সান্নিধ্যে বড় করেন — যেমনটি সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত কাহিনিতে পাওয়া যায়। তিনি ছোটবেলা থেকেই নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতেন, এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়েননি।

তাঁর মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসদ ইবন হাশিম, যিনি নবী ﷺ-এর পিতার চাচাতো বোন। তিনি প্রথম হাশেমিয়া নারী, যিনি হাশেমি বংশে সন্তান জন্ম দিয়েছেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূলের সাহচর্যে ছিলেন এবং রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আহমদ, কাজী ইসমাঈল, ইমাম আন-নাসায়ী এবং আবু আলী নাইসাবুরী বলেছেন:

সাহাবীদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে উত্তম সনদসহ (সহীহ সূত্রে) যত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তত অধিক হাদীস কোনো সাহাবীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়নি, যতটা এসেছে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সম্পর্কে।
আর এর কারণ মনে হয় এই যে— তিনি (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগ পরে ঘটেছিল।

তাঁর সময়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লোক বিদ্রোহ করেছিল— এটা ছিল একটি বড় কারণ, যার ফলে তাঁর ফজিলত ও মর্যাদাসমূহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ অনেক সাহাবী তখন তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন করে তাঁর মর্যাদাগুলো প্রচার করেন।

فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ لَكِنِ الْمُبْتَدَعَةُ قَلِيلَةٌ جِدًّا ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مَا كَانَ فَنَجَمَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى حَارَبُوهُ ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ فَتَنَقَّصُوهُ **وَاتَّخَذُوا لَعْنَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ سُنَّةً**

সেসময় মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তবে বিদআতিদের দল ছিল খুবই অল্পসংখ্যক। এরপর হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে যা ঘটেছিল, তা ঘটল, ফলে আরেকটি দল উদ্ভব হলো যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।
অবস্থার ভয়াবহতা আরও বেড়ে যায় তারা তাঁকে অপমান করতে শুরু করে, **এমনকি মিম্বারে তাঁকে লানত দেওয়াকে তারা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করেছিল।**

وَوَافَقَهُمُ الْخَوَارِجُ عَلَى بُغْضِهِ وَزَادُوا حَتَّى كَفَّرُوهُ مَضْمُومًا ذَلِكَ مِنْهُمْ إِلَى عُثْمَانَ فَصَارَ النَّاسُ فِي حَقِّ عَلِيٍّ ثَلَاثَةً أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْمُبْتَدِعَةَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُحَارِبِينَ لَهُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَأَتْبَاعِهِمْ

খারিজিরাও হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি বিদ্বেষে তাদের (বনু উমাইয়া ও বিরোধীদের) সঙ্গে একমত হয়েছিল, বরং তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তাঁকে কাফির পর্যন্ত ঘোষণা করে। তারা এই অবস্থানে কেবল আলীর বিরুদ্ধেই থেমে থাকেনি, বরং হযরত উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ফলে মানুষ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিষয়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে:

1. আহলুস সুন্নাহ,
2. বিদআতকারীরা, যারা ছিল খারিজি দলভুক্ত,
3. আর যুদ্ধকারী দল, অর্থাৎ বনু উমাইয়া ও তাদের অনুসারীরা।

فَاحْتَاجَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى بَثِّ فَضَائِلِهِ فَكَثُرَ النَّاقِلُ لِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَالَّذِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ إِذَا حُرِّرَ بِمِيزَانِ الْعَدْلِ لَا يَخْرُجُ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَصْلًا.

তখন আহলুস সুন্নাহর প্রয়োজন হয় হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ফজিলত ও মর্যাদা প্রকাশ করার, ফলে যারা এই ফজিলতসমূহ বর্ণনা করত, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কারণ আলীর বিরোধী ব্যক্তির সংখ্যাও অনেক ছিল।

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে বিচার-বিবেচনার মানদণ্ডে যদি নিরপেক্ষভাবে দেখা হয়,

তাহলে খোলাফায়ে রাশেদিন চারজন (আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম) প্রত্যেকেরই এমন ফজিলত রয়েছে, যা বিচার ও ভারসাম্যের আলোকে পর্যালোচনা করলে কোনোটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ-এর আকীদা ও পথ থেকে বিচ্যুত নয়।[3]

মারওয়ান মিম্বারে দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দেয়, অথচ তখন হযরত হাসান ইবনু আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন নবীজির হুজরার ভেতরঃ

ইবনু ‘আসাকির বর্ণনা করেছেন:

উমাইর ইবনু ইসহাক বলেন: মারওয়ান ইবনুল হাকাম আমাদের ওপর ছয় বছর শাসক ছিলেন, তিনি প্রতি জুমার দিনে মিম্বারে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিতেন।

পরে তাঁকে বরখাস্ত করা হয় এবং তার স্থলে **সাঈদ ইবনু আল-‘আস** দুই বছর শাসক ছিলেন, তিনি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিতেন না। তারপর তাকেও বরখাস্ত করে আবার **মারওয়ানকে নিয়োগ করা হয়**, আর তিনি আবার আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিতে শুরু করেন।

লোকেরা বলল:

“হে হাসান! আপনি কি শুনছেন না, এ ব্যক্তি (মারওয়ান) কী বলছে?”

তিনি (হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কিছুই জবাব দিতেন না।

---

[3] ফাতহুল বারী খ ৭, পৃ ৭১

তিনি প্রতি জুমার দিনে আসতেন এবং নবী ﷺ- এর হুজরায় প্রবেশ করে সেখানে বসে থাকতেন। যখন খুতবা শেষ হতো, তখন বের হয়ে সালাত আদায় করতেন এবং তারপর নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। [4]

মারওয়ান আহলুল বাইতকে লানত দেয়ঃ

ইবনু 'আসাকির বর্ণনা করেছেন:

আবু ইয়াহইয়া বলেন: আমি একদিন ছিলাম হাসান ইবনু আলী ও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর মাঝখানে, আর মারওয়ান ইবনুল হাকামও সেখানে ছিলেন।

হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মারওয়ানের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করছিলেন, তখন হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হুসাইনকে তা থেকে বিরত রাখছিলেন।

অবশেষে মারওয়ান বলে বসলো:

إنكم أهل بيت ملعونون

"তোমরা এক অভিশপ্ত পরিবার

এ কথা শুনে হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) রাগে ফেটে পড়লেন এবং বললেন:

"ধ্বংস হোক তোমার! তুমি বলো, আমরা এক অভিশপ্ত পরিবার?! আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার বাবাকে তাঁর নবীর ﷺ মুখ দিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন তখন তুমি ছিলে তার পিঠে (অর্থাৎ তার বংশে)।" [5]

---

[4] তারিখে দিমাশক ৫৭/২৪৩

[5] তারিখে দিমাশক ৫৭/২৪৪

শক্তিশালী প্রমাণঃ

তাঁদের (আহলুল বাইতের) অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো আমাদের সায়্যিদ হাসান ইবন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা) এর দাফনের ঘটনা, এবং হাসান আল-বসরী (রহ.)-এর মুরসাল হাদীস রেওয়ায়েত করা, যা করা হয়েছিল হাদীসের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং আমাদের সায়্যিদ হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি গালিগালাজ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে।

আমাদের সায়্যিদ হাসান ইবন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর দাফনের কাহিনি:

ইবনু সা'দ বর্ণনা করেন:

হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর মৃত্যুকালে ওসিয়ত করেন, যদি সম্ভব হয়, তাহলে যেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে দাফন করা হয়।

কিন্তু যদি সে পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং আশঙ্কা থাকে যে, এক বিন্দু রক্তপাত হবে, তাহলে যেন তাঁকে তাঁর মা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)-এর কবরের পাশে জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করা হয়।

হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তখন তাঁর ভাই হুসাইনকে ওসিয়ত করছিলেন:

"হে ভাই, আমার কারণে কখনো রক্তপাত করো না, কারণ মানুষ খুব দ্রুত ফিতনার দিকে ঝুঁকে পড়ে।"

যখন হযরত হাসান (রাযি.) ইন্তিকাল করেন, তখন পুরো মদীনা কেঁপে ওঠে কান্নায়। রাস্তার যার সাথেই সাক্ষাৎ হয়, দেখা যায় সে কাঁদছে।

সেই দিনে মারওয়ান মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাঁকে হাসান ইবন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর সংবাদ জানায় এবং জানায়, তারা তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের পাশে দাফন করতে চায়।
মারওয়ান লিখে পাঠায়: "তারা কখনোই এই কাজে সফল হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি।"
এরপর হুসাইন ইবন আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী ﷺ-এর কবরের কাছে এসে বললেন: "এখানে কবর খনন করো।"
সেই সময়ে মদীনার শাসক ছিলেন সাঈদ ইবন আল-'আস, তিনি সরে দাঁড়ালেন, তিনি কোনো বাধা সৃষ্টি করলেন না।

মারওয়ান বনী উমাইয়াদের মধ্যে চিৎকার করে বলে উঠল, তাদের চারদিকে লোক জড়ো করল এবং সবাই অস্ত্রে সজ্জিত হলো।
মারওয়ান বলল:
"এটা কোনোদিনই হতে দেওয়া যাবে না!"
তখন হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন:
"হে যরকায় (এক দুশ্চরিত্রা নারী)–এর পুত্র! তোমার কী অধিকার আছে এ ব্যাপারে? তুমি কে এতে হস্তক্ষেপকারী?"

মারওয়ান বলল:
"না, এটা হতে পারবে না, আর আমি বেঁচে থাকতে কেউ এতে সফল হতে পারবে না।"
তখন হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) "হিলফুল ফুদূল" (একটি ঐতিহাসিক ন্যায়-সংগঠন)-এর নামে আহ্বান করলেন।

তখন হাশেম, তাইম, জুহরা, আসদ এবং বনু লায়স গোত্রের বনু জাওনা ইবনু শু'ব লোকেরা একত্রিত হলো, তারা সবাই অস্ত্র ধারণ করেছিল। মারওয়ান একটি পতাকা (যুদ্ধের নিশান) স্থাপন করল, আর হুসাইন ইবনু আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-ও একটি পতাকা স্থাপন করলেন।

হাশেমীয়রা বললেনঃ

“তিনি অবশ্যই নবী ﷺ-এর পাশে দাফন হবেন।” এমনকি উভয়পক্ষের মধ্যে তীর নিক্ষেপ পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়।

সেদিন ইবনু জাউনা ইবনু শু'ব ছিল তার খোলা তলোয়ার হাতে। তখন কুরাইশের অনেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন— আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর ইবনু আবি তালিব, এবং মিসওয়ার ইবনু মাখরামা ইবনু নাওফাল।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর বারবার হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে অনুরোধ করতে লাগলেন এবং বললেন:

"হে চাচাতো ভাই! তুমি কি তোমার ভাইয়ের ওয়সিয়ত শুনছ না? তিনি বলেছিলেন:

যদি তুমি আশঙ্কা করো যে এক ফোঁটা রক্তপাত হবে, তাহলে আমাকে আমার মায়ের পাশে জান্নাতুল বাকি‘তে দাফন করো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি— তুমি যেন কারো রক্ত না ঝরাও।"

কিন্তু হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জোর করেই বলছিলেন যে, “তিনি রাসূল ﷺ-এর পাশেই দাফন হবেন।” আর ইঙ্গিত করে বলছিলেন: “মারওয়ান! তার কী অধিকার এসব বিষয়ে?”

তখন মিসওয়ার ইবনু মাখরামা বললেন:

হে আবূ আবদিল্লাহ (হুসাইন)! আমার কথা শোনো। তুমি আমাদের হিলফুল ফুদূল (ন্যায়-সংগঠন)-এর নামে ডাক দিয়েছ, আমরাও তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি।
জানো কি, আমি তোমার ভাই হাসানকে মৃত্যুর একদিন আগে বলতে শুনেছি:
'হে ইবনু মাখরামা! আমি আমার ভাইকে বলে গেছি, যদি রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফনের সুযোগ মেলে, তবে যেন আমাকে সেখানে দাফন করে। আর যদি এতে রক্ত ঝরার আশঙ্কা থাকে, তবে যেন আমাকে আমার মা ফাতিমার পাশে জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করে।
আর আমি তাকে আল্লাহর নামে স্মরণ করিয়ে বলেছি— যেন সে কোনো রক্তপাত না ঘটায়।
তিনি আরও বললেন:
"তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না— এখানে কত অস্ত্রধারী ও লোকজন জড়ো হয়েছে?
মানুষ খুব দ্রুত ফিতনার দিকে ঝুঁকে পড়ে।"

তবুও হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দাফনে অনড় ছিলেন। আর বনি হাশিম ও তাদের মিত্ররা উচ্চস্বরে বলছিলেন: "তিনি কখনোই দাফন হবেন না— কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশেই!"

হাসান ইবনু মুহাম্মদ বলেন:
আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি:
"সেদিন আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখেছিলাম যে, আমি মারওয়ানের গর্দান উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। তাকে হত্যা করতে

আমাকে যে একমাত্র জিনিস বিরত রেখেছিল, তা হলো— আমি তাকে সে শাস্তির উপযুক্ত মনে করলেও, আমার ভাইয়ের ওসিয়ত ছিল এই যে:
'যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে এক ফোঁটা রক্ত ঝরবে, তাহলে আমাকে বাকি' গোরস্থানে আমার মায়ের পাশে দাফন করো।
আমি আমার ভাইকে বললাম:
"হে আবা আবদিল্লাহ (হুসাইন)! তুমি ছিলে তাঁর মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের, তবে আমি এটাও বলেছিলাম: আমরা এসব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পিছু হটছি না ভীতু হয়ে, বরং আমরা অনুসরণ করছি আবু মুহাম্মদের (হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওসিয়ত।

আল্লাহর কসম! যদি তিনি বলতেন, 'আমাকে রাসূল ﷺ—এর পাশে দাফন করো', তবে আমরা একে একে সবাই প্রাণ দিয়ে দিতাম অথবা তাঁকে সেখানেই দাফন করতাম। কিন্তু তিনি যে ভয় করলেন — তা এখন তোমরা চোখে দেখছো, এবং সে জন্যই তিনি বলেছিলেন: 'যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে এক ফোঁটা রক্ত ঝরবে, তাহলে আমাকে আমার মায়ের পাশে বাকি' গোরস্থানে দাফন করো।' আমরা কেবল তাঁর এই অঙ্গীকার অনুসরণ করছি এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করছি।"

তিনি (হাসান ইবনু মুহাম্মদ) বলেন:
অবশেষে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ভাইয়ের ওসিয়ত মেনে নিলেন, যা আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি যে, তিনি মানবেন। তারপর আমরা হযরত হাসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কাঁধে তুলে নিয়ে গেলাম এবং বাকি' গোরস্থানে দাফন করলাম।

সাঈদ ইবনু আল-'আস জানাজায় ইমামতি করতে এলেন। তখন বনি হাশিম বলল:

"তাঁর ওপর সালাত (জানাজা) আদায় করবে না কেউ— হুসাইন ছাড়া।"

তখন সাঈদ ইবনু আল-'আস সরে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

"আল্লাহর কসম! আমি জানাজার ইমামতির বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কোনো বিরোধ করব না। তোমরাই তো তোমাদের মৃতের অধিক হকদার। তবে যদি তোমরা আমাকে অগ্রাধিকার দাও, তাহলে আমি ইমামতি করব।"

তখন হুসাইন ইবনু আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

تقدم فلولا أن الأئمة تقدم ما قدمناك

"তুমি এগিয়ে এসো, যদি ইমামগণ (শাসক বা নেতৃস্থানীয়রা) অগ্রে না যেতো, তাহলে আমরাও কখনো তোমাকে অগ্রে দিতাম না।"[6]

হাসান আল-বসরী (রহ.)-এর মুরসাল হাদীস রেওয়ায়েত করাঃ

ইমাম মুহাম্মদ আবিদ আস-সিনদী আল-আয়ূবী (রহ.) (মৃত্যু: ১২৫৭ হি.) বলেন:

মূসা ইবনু উবাইদ বলেন, আমি হাসান (রহ.)-কে বললাম: "হে আবা সাঈদ! আপনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন', অথচ আপনি তো তাঁকে পাননি (সাক্ষাৎ করেননি)!"

তিনি বললেন:

---

[6] ইবনু সাদ (ওফাত ২৩০ হি), আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ / ৩৪১ – ৩৪৪।

“হে আমার ভাইয়ের সন্তান! তুমি এমন একটি প্রশ্ন করেছ যা আমাকে এর আগে কেউ জিজ্ঞেস করেনি। আর যদি তোমার আমার কাছে বিশেষ মর্যাদা না থাকত, তবে আমি তোমাকে এই তথ্য দিতাম না।

আমি এমন এক সময়ে আছি— যেমনটি তুমি দেখছো।” (অর্থাৎ, এটা হজ্জাজের শাসনকাল ছিল।)

مَتَى سَمِعْتَنِيْ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ غَيْرَ أَنِّيْ لَا أَسْتَطِيْعُ أَذْكُرَ عَلِيًّا

যখনই তুমি আমাকে বলতে শুনবে, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন’, জেনে রেখো, তা হচ্ছে আলী ইবনু আবি তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর থেকে বর্ণিত। তবে আমি তাঁর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নাম প্রকাশ করতে পারি না।” [7]

আহলে বায়তের ঘরে ঘরে শুরু হল যেই মাহফিলঃ

তাদের ঘরবাড়িতে শুরু হয় মাজালিস তাঁদের সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যের পথে দিশা দেওয়ার জন্য:

কারবালার ময়দানে শাহাদাত সংঘটিত হল। যোগ হল মসজিদে নববীর মিম্বর সহ মুসলিম জাহানের মিম্বরে মিম্বরে সাইয়িদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তথা সম্মানিত আহলে বায়তকে লানত দেয়া।

তাই এটা একেবারে স্বাভাবিক ছিল যে, নবী ﷺ-এর আহলুল বাইত সেই জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন।

7

- হাসরুস শারিদ মিন আসানীদি মুহাম্মাদ আবিদ ২/৭০৪, মাকতাবাতুর রুশদ।
- তাহজীবুল কামাল ৬/১২৪

ফলে তাঁদের ঘরবাড়িতে ধর্মীয় ও আত্মিক বৈঠক শুরু হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্য ও হক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

দিন ও যুগ অতিবাহিত হতে থাকে, আর আহলুল বাইত এ ঘরোয়া বৈঠকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

উমাইয়্য ও আব্বাসীয় যুগ অতিক্রম করে, ফাতিমীয়রা যখন শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন তাঁরা এই বৈঠকগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও সর্বজনীনভাবে আয়োজন করতে শুরু করেন। তখন থেকেই রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থাপনায় উদযাপিত সেই মাহফিলের নামকরণ হয়ে যায় "আল-ইহতিফাল বিল মাউলিদ" বা "মাউলিদুন্নাবী মাহফিল", ক্রমান্বয়ে এই নাম আরো সংক্ষেপ হয়, শুধু "মাউলিদ"। এক সময় এইসব মাহফিলকে মাজালিস মুহাম্মাদিয়্যাহ নামেও অভিহিত করা হত।

তাই আমরা দেখি— আরবের আহলুল বাইত ও সায়্যিদগণ সর্বসম্মতভাবে এই মোহাম্মদী মাহফিল তথা নবী ﷺ–এর প্রশংসামূলক মাহফিলগুলো আয়োজন করে থাকেন। তাঁরা সাপ্তাহিক মীলাদুন্নবী উদযাপনেও গভীর আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে থাকেন, যেমনটি আমরা স্বচক্ষে দেখি ও অংশগ্রহণও করি।

বিশেষ করে হারামাইন শরীফাইন (মক্কা-মদিনা)-এ, আহলুল বাইতের ঘরবাড়িতে এই মোহাম্মদী মাহফিল ও নবীজির ﷺ জন্মোৎসব পালন হয়ে আসছে সেই সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত। এই মাহফিলগুলোকে "মাউলিদ" নামেই অভিহিত করা হয়।

এগুলো আবার ফিরে এসেছে যেমন প্রথম শুরু হয়েছিল, যেখানে শুরু হয়েছিল, এবং তা আল্লাহর ইচ্ছায় চলমান থাকবে, যতদিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চান।